بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২শে জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

অর্থ: আর অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় অনুপাতে হয়ে থাকে। কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শোধরানোর উদ্দেশ্যে যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আশ্ শূরা: ৪১)

ইসলামী শিক্ষায় অপকর্মশীল বা ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির সাথে এমন ব্যবহারের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যাতে অন্তর্নিহিত থাকবে তার সংশোধনের দিক; তা সেই ক্ষতি স্বল্প পরিসরে হোক বা বৃহৎ পরিসরে বা সেই ক্ষতিসাধনকারী শত্রুই হোক না কেন। ইসলামে শাস্তির বিধান অবশ্যই রয়েছে কিন্তু পাশাপাশি ক্ষমা এবং মার্জনার নির্দেশও রয়েছে। উক্ত আয়াতেও, আপনারা যা শুনেছেন, এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, মন্দকর্মশীল ব্যক্তি বা পাপীকে শাস্তি দাও কিন্তু এই শাস্তির পেছনে চালিকা শক্তি হওয়া উচিত সেই পাপাচারী বা ক্ষতিসাধনকারী এবং অপরাধীর সংশোধন। অতএব যেখানে সংশোধনই মূল উদ্দেশ্য সেখানে শাস্তি দেয়ার পূর্বে চিন্তা কর যে, শাস্তির দেওয়ার ফলে এই লক্ষ্য অর্জন হবে কিনা। এটি চিন্তা করার পর এবং অপরাধীকে দেখার পর যদি এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় যে, ক্ষমা করলেই এই অপরাধীর সংশোধন সম্ভব তাহলে ক্ষমা কর আর যদি মনে করো যে শাস্তি প্রদান করলে সংশোধনের সম্ভাবনা আছে তাহলে শাস্তি দাও। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ক্ষমা করা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করবে। আয়াতের শেষের দিকে 'إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ' বলে একথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যদি সীমালঙ্ঘন কর তাহলে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাহোক পবিত্র কুরআনে শাস্তি এবং সংশোধনের এমন নীতি এবং আইন উপস্থাপিত হয়েছে যা আমাদের ব্যক্তি জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদিকে পুরোপুরী তুলে ধরে আর রাষ্ট্রীয় বরং আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও সামাজিক সংশোধনের এটিই ভিত্তি। আমি যেমনটি বলেছি, কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো, তার সংশোধন এবং চারিত্রিক উন্নতি। অতএব ইসলামের শিক্ষা হলো, কেবল শাস্তির ওপর জোর না দিয়ে সংশোধনের ওপর জোর দাও। যদি মনে কর, ক্ষমা করলে সংশোধন হবে তাহলে ক্ষমা কর। আর পরিস্থিতি এবং ঘটনা প্রবাহ যদি বলে যে, শাস্তি দিলে সংশোধন হবে তাহলে শাস্তি দাও। কিন্তু শাস্তি প্রদানে এ কথা অবশ্যই দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, শাস্তি অপরাধ অনুপাতে হওয়া উচিত, নতুবা কৃত অপরাধ

থেকে যদি বেশি শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটি অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন আর অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনকে খোদা তা'লা পছন্দ করেন না।

অতএব ইসলামে পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মত বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য নেই। এর সুমহান দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়। তিনি যখন দেখেন যে, অপরাধী সংশোধিত হয়েছে বা তার সংশোধন হয়ে গেছে তখন চরম শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর ওপর, তাঁর সন্তান-সন্ততির ওপর এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর হেন কোন অন্যায় বা অত্যাচার নেই যা করা হয়নি কিন্তু শত্রু যখন ক্ষমার প্রত্যাশী হলো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপনের অঙ্গীকার করলো তখন তিনি (সা.) সবকিছু ভুলে গিয়ে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা থেকে হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর আদরের কন্যা হযরত যয়নবের ওপর এক পাষন্ড হাব্বার বিন আসাদ বর্শা দিয়ে প্রাণঘাতি আক্রমন করে। তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সেই হামলার কারণে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং তার গর্ভপাত ঘটে। অবশেষে এই আঘাত তার জন্য প্রাণহারী প্রমাণিত হয়। এ কারণে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার রায় প্রদান করা হয়। মক্কা বিজয়ের সময় এই ব্যক্তি কোথাও পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সা.) যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন হাব্বার মদিনায় তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে, আপনার ভয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বড় বড় অপরাধ রয়েছে আর আপনি আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু আপনার দয়া এবং মার্জনার খবর আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। যদিও আপনি আমার বিরুদ্ধে শাস্তির রায় দিয়েছেন কিন্তু আপনার ক্ষমা এবং মার্জনা এত ব্যাপক যে, এরফলে আমার মাঝে এই সাহস সৃষ্টি হয়েছে আর আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা অজ্ঞতা এবং বহুশ্বরবাদে বা শির্‌কে নিমজ্জিত ছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জাতিকে আপনার মাধ্যমে হিদায়াত দিয়েছেন এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। আমি আমার সীমালঙ্ঘন এবং অপরাধ স্বীকার করছি, আপনি আমার অজ্ঞতা উপেক্ষা করুন। এতে মহানবী (সা.) তাঁর কন্যার এই হন্তারককেও ক্ষমা করেন এবং বলেন, যাও হাব্বার তোমার ওপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হয়েছে, তিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের এবং সত্যিকার তওবা বা অনুশোচনা করার তৌফিক দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন কবি যার নাম ছিল কা'ব বিন জহির। সে মুসলমান নারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় কবিতা লিখতো, তাদের সম্ভ্রমে হামলা করতো। তার বিরুদ্ধেও শাস্তির সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন কা'বের ভাই তাকে লিখেছে, মক্কার পতন ঘটেছে, তোমার জন্য ভালো হবে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। সে মদীনায় এসে পরিচিত এক ব্যক্তির ঘরে অবস্থান করে আর মসজিদে নববী-তে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে ফজরের নামায পড়ে। এরপর নিজের পরিচয় না দিয়েই সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কা'ব বিন জহির অনুশোচনার সাথে ফিরে এসেছে এবং ক্ষমা চাচ্ছে, যদি

অনুমতি থাকে তাহলে তাকে আপনার সকাশে উপস্থিত করা যেতে পারে। তিনি (সা.) যেহেতু তার চেহারা সম্পর্কে জানতেন না, তাকে চিনতেন না বা হতে পারে সে ব্যক্তি মুখ ঢেকে রেখেছিল যার ফলে অন্যান্য সাহাবীরাও চিনতে পারেনি; তাই তিনি (সা.) বলেন যে, হ্যাঁ সে আসতে পারে। তখন সেই ব্যক্তি বলে, আমিই কা'ব বিন জহির। তখন এক আনসারী তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় কেননা; তার অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধেও মৃত্যুর দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) পরম স্নেহ পরবশ হয়ে বলেন, একে ছেড়ে দাও কেননা সে ক্ষমা প্রত্যাশী হয়ে এখানে এসেছে। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর সন্নিধানে একটি কাসীদা বা কবিতার অর্ঘ্য পেশ করে। মহানবী (সা.) তাঁর এক দৃষ্টিনন্দন চাদর তখন পুরস্কারস্বরূপ তাকে উপহার দেন।

অতএব এই শত্রু, যার বিরুদ্ধে মৃত্যু দন্ডাদেশ জারী করা হয়েছিল, তাঁর দরবার থেকে শুধু প্রাণ ভিক্ষা নিয়েই ফিরেনি বরং পুরস্কার সহকারে ফিরে গিয়েছে। এমন আরো অনেক ঘটনা তাঁর (সা.) জীবনে দেখা যায় যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সংশোধনের পর তিনি (সা.) তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুদেরও ক্ষমা করেছেন, তাঁর নিকটাত্মীয়ের যারা শত্রু ছিল তাদেরকেও ক্ষমা করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদেরও ক্ষমা করেছেন। কিন্তু যেখানে সংশোধনের জন্য শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন ছিল সেখানে শাস্তিও দিয়েছেন। অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের আসল উদ্দেশ্য হলো সংশোধন, প্রতিশোধ নেয়া নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা এবং বক্তৃতায় বেশ কয়েক স্থানে সূরা শূরার এই আয়াতের অর্থাৎ ৪১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর প্রায় ১৩টি বইয়ে এর বরাতে আলোচনা দেখা যায়, এর চেয়েও বেশি হতে পারে। আর এই বইগুলোর ২১/২২টি জায়গায় এই বরাতে তিনি আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর অধিবেশন বা বিভিন্ন বৈঠকেও এ সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন। 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তকে তিনি (আ.) শাস্তি ও পুরস্কারের দর্শন এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

(এই আয়াতের আলোকে) অন্যায়ের শাস্তি অন্যায় অনুপাতে হওয়া উচিত, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় ক্ষমা করে আর এমন ক্ষেত্রে করে যার ফলে সংশোধন হয়, কোন অপছন্দনীয় দিক সামনে না আসে অর্থাৎ মার্জনার যথাযথ স্থানে মার্জনা করে, অ-স্থানে নয়, তাহলে এমন ব্যক্তি এর প্রতিদান পাবে (অর্থাৎ ক্ষমাশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পুরস্কৃত হবে)। তিনি (আ.) বলেন, এই আয়াত থেকে প্রতিভাত হয়, কুরআনী শিক্ষা এমনটি নয় যে, কোন স্থানে অন্যায়ের মোকাবিলা করা যাবে না এবং দুস্কৃতকারী ও অত্যাচারীকে শাস্তি দেয়া হবে না (যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হয়) বরং কুরআনী শিক্ষা হলো এটি দেখা যে, সেই স্থান এবং কালটি অন্যায় ক্ষমা করার নাকি শাস্তি দেয়ার। তাই অপরাধীর পক্ষে এবং সাধারণ মানুষের জন্য যা কিছু সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর সেই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত। তিনি বলেন, অনেক সময় পাপ ক্ষমা করলে এক অপরাধী তওবা করে আর কোন কোন সময় অপরাধ ক্ষমা করার ফলে একজন অপরাধী আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, চোখ বন্ধ করে অন্ধের ন্যায় শুধু অন্যায় ক্ষমা

করার অভ্যাস রপ্ত করো না। এটি নয় যে, আমরা শুধু (পাপ) ক্ষমাই করবো আর এটিই আমাদের একমাত্র কাজ, বরং সেই নির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা কর অর্থাৎ তোমাদের লক্ষ্য সংশোধন হওয়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন, গভীর দৃষ্টিতে দেখ! সত্যিকার পুণ্য কোথায় নিহিত, ক্ষমার মাঝে নাকি শাস্তি দেয়ার মাঝে। অতএব যে কাজ স্থানকাল ভেদে যুক্তিযুক্ত তাই কর। মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, যেভাবে কোন কোন মানুষ চরম প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে থাকে, এমনকি পিতা-পিতামহের যুগের প্রতিশোধের স্পৃহাও নিজেদের মাঝে লালন করে অনুরূপভাবে কোন কোন মানুষ মার্জনা এবং ক্ষমার ক্ষেত্রেও সীমা ছাড়িয়ে যায়। অনেক সময় এই অভ্যাস এতটাই সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, মানুষ আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে বসে। আর এমন লজ্জাস্কর মার্জনা এবং ক্ষমা তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় যা সত্যিকার অর্থে আত্মসম্মানবোধ, আত্মাভিমান এবং পবিত্রতা পরিপন্থী হয়ে থাকে আর তা নেক চাল-চলনকে কলুষিত করে। এমন ক্ষমা এবং মার্জনার ফলাফল যা হয়ে থাকে তাহলো, সবাই ছি ছি করে উঠে। এসব অপছন্দনীয় দিকসমূহের নিরিখেই পবিত্র কুরআনে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্থান ও কালের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে আর এমন চারিত্রিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যকে পছন্দ করা হয়নি যা অযথা ও অস্থানে প্রকাশ পায়।

অতএব ইসলামী শাস্তির দর্শনে এটিই মূল কথা যে, দেখতে হবে পুণ্য কি-সে নিহিত এবং সংশোধন কীভাবে সম্ভব। অনেক সময় ক্ষমা করা পুণ্যে পর্যবসিত হয় কেননা এর ফলে সংশোধন হবে বা সংশোধন হয়, কিন্তু অনেক সময় তা পাপের কারণ হয়। কেননা এর ফলে অন্যায়কারী অন্যায়ে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠে। একইভাবে অনেক সময় শাস্তি প্রদানও পুণ্যে পর্যবসিত হয়। এটি সেই ব্যক্তির প্রতিও পুণ্য করার নামান্তর কেননা; শাস্তির মাধ্যমে তাকে পাপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় যেন সে নিজের পরবর্তী দিনগুলোকে পাপ থেকে বিরত থেকে ধ্বংস থেকে রেহাই পায় বা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। মহানবী (সা.) যাদের ক্ষমা করেছেন, যে দু'টো দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করেছি তাতে আমরা দেখতে পাই, তাদের মাঝে অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে। ইসলামের শত্রুরা অপকর্মশীল ছিল কিন্তু নিজেদের সংশোধনের পর তারাই সৎকর্মশীল হয়ে উঠে এবং ইসলামের সেবকে পরিণত হয়। অতএব ইসলাম এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম যা সকল যুগে স্বীয় শিক্ষার গুরুত্ব দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করে। অপরাধীর পক্ষে যা কল্যাণকর তাই কর। আজকাল যারা মানবাধিকারের ধ্বজাধারী সাজে তারা একপেশে নীতি অনুসরণ করছে । কারো অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন মানবিক সহমর্মিতার নামে এসব অপরাধীদেরও এতটা ধৃষ্ট করে তোলা হয় যে, অনেক অপরাধীর হৃদয় থেকে তারা যে অপরাধ করছে সেই চেতনাই লোপ পেয়েছে। তারা হন্তারক হয়ে উঠেছে, পেশাদার খুনীতে পরিণত হয়েছে এবং অহংকারে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, নিজেদের জীবন ছাড়া আর কারো জীবনের কোন গুরুত্বই আছে বলে তারা মনেই করে না। এমন লোকদের শাস্তি মৃত্যুদন্ডই দেওয়া উচিত, তবে হ্যাঁ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু পাশ্চাত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে

মানবাধিকারের নামে এই শাস্তি প্রদান করা হয় না। বিভিন্ন দেশ তাদের সংবিধান পরিবর্তন করে এই শাস্তির বিধানকেই মুছে ফেলেছে যেখানে কিনা এমন লোকদের সংশোধনও দৃষ্টিগোচর হয় না আর তারা যুলুম এবং অন্যায়েও সীমা লঙ্ঘন করে। অথবা দ্বিতীয় প্রকার সীমা লঙ্ঘন চোখে পড়ে। যেমন মুসলমান দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ আন্দোলন করে তাদেরকে সিংহাসনচ্যুত করেছে বা ক্ষমতাচ্যুত করেছে আর এরপর তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে যদি শাস্তি পাওয়ার থাকে তাহলে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের হাতে তাদেরকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর স্থানীয় জনসাধারণ যখন তাদের নেতাদের ওপর যুলুম করে তখন আসলে এর পিছনে কতিপয় পরাশক্তির প্ররোচনা থাকে যার ওপর ভিত্তি করেই এসব কিছু করা হয়।

ইসলাম সকল প্রকার বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্য প্রদর্শনে বারণ করে। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে শাস্তির কথা বলেছেন সেখানে ধনী-দরিদ্র সবার সাথে সমান ব্যবহারের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঠিক ততটাই শাস্তি দাও যতটা অপরাধ করেছে এবং শাস্তি প্রদানের কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ কর। আর আমরা দেখতে পাই, মদিনায় শাসনকালে মহানবী (সা.) এবং তাঁর পর খলীফারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দেখিয়েছেন, কীভাবে শাস্তি দেয়া উচিত আর শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যই বা কী।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কেবল এটি দেখলেই চলবে না যে, অপরাধীর জন্য কী কল্যাণকর। অর্থাৎ শুধু অপরাধীর দিকে দেখলেই চলবে না, অনেক সময় এটিও দেখতে হয় যে, সমাজের জন্য কী কল্যাণকর। অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থে তুচ্ছ বিষয়কে উপেক্ষা করা বা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই যে কোন শাস্তির সিদ্ধান্তের সময় এটি দেখা আবশ্যক যে, সামগ্রীক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের ওপর কী প্রভাব পড়ছে। অনেক সময় ক্ষমা করা সমাজে ভ্রান্ত মনোবৃত্তির জন্ম দিয়ে থাকে! যেমন মানুষ বলে যে দেখ কত বড় অপরাধী! অথচ এই অন্যায় কাজ করেও পার পেয়ে গেছে। দুস্কৃতকারী মানুষ তখন মনে করে, আমরাও অন্যায় করে এরপর ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যাব। এই পরিস্থিতি এক পর্যায়ে অপরাধীকে অপকর্মে ধৃষ্ট করে এবং তার হাতকে শক্তিশালী করে। একইভাবে এর ফলে ভদ্র মানুষের মনে ভীতি দানা বাঁধে বা মোটের ওপর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আর তখন তারা এই উৎকণ্ঠা দূর করার কৌশল সন্ধান করে। যদি এমন আইনহীনতা বিরাজ করে তাহলে অধিকাংশ মানুষ নিঃসন্দেহে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও নিয়ে থাকে কিন্তু এমন আইনহীনতা না হলেও যদি নিরাপত্তার অভাব থাকে তাহলে কিছু মানুষ আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এত দৃষ্টিনন্দন ইসলামী শিক্ষা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলমান দেশে এই পরিস্থিতিই আমাদের চোখে পড়ে। শাস্তি এবং ক্ষমার অসম প্রয়োগ ও অন্যায় আচরণ অপরাধী সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে আর এর ফলে অন্যরাও একই আচরণ আরম্ভ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

শাস্তি দেয়া এবং ক্ষমার ক্ষেত্রে একটি অনেক বড় বিষয় দৃষ্টিতে রাখা চাই আর তাহলো, সমাজ এই শাস্তি এবং ক্ষমার কি প্রভাব গ্রহণ করছে? যদি ক্ষমা মানুষকে ধৃষ্ট করে তোলে তাহলে ক্ষমা নয় বরং শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার তওরাত এবং ইঞ্জিলের সাথে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার তুলনা করতে গিয়ে বলেন,

ইঞ্জিলে লেখা আছে, তুমি অন্যায়ের প্রতিউত্তর দিবে না। অর্থাৎ ইঞ্জিলে লেখা আছে যে, তুমি অন্যায়ের মোকাবিলা করো না। এক কথায় ইঞ্জিলের শিক্ষা শিথীলতাপ্রবণ। বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশ ছাড়া মানুষ এটি গ্রহণই করতে পারে না। পক্ষান্তরে তওরাতের শিক্ষার প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে এতে বাড়াবাড়ির প্রবণতা দেখা যায়। তাতে শুধু একটি কথার ওপরই জোর দেয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, কানের বিনিময়ে কান এবং দাঁতের বিনিময়ে যেন দাঁত ফেলে দেয়া হয়। এতে মার্জনা এবং ক্ষমার নাম চিহ্নও দেখা যায় না। আসল কথা হলো, এই সব গ্রন্থ বিশেষ জাতি এবং বিশেষ যুগের জন্য ছিল। কিন্তু কুরআন আমাদের কতই না পবিত্র পথের দিশা দিয়েছে যা সকল প্রকার বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য হতে মুক্ত এবং একান্তভাবে মানবপ্রকৃতি সম্মত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ। অর্থাৎ যতটা অন্যায় করা হয়েছে ততটাই শাস্তি দেয়া বৈধ। কিন্তু কেউ যদি মার্জনা করে আর এই মার্জনার মূল উদ্দেশ্য হয় সংশোধন হয়ে থাকে, অযথা এবং অস্থানে যদি মার্জনা প্রদর্শিত না হয় বরং যথাস্থানে প্রদর্শিত হয় তাহলে এমন মার্জনাকারীর জন্য প্রতিদান রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার কাছে সে পাবে। অতএব দেখ! কত পবিত্র শিক্ষা এটি, কোন বাড়াবাড়িও নেই আর শৈথিল্যও নেই। এতে প্রতিশোধের অনুমতি আছে কিন্তু একই সাথে ক্ষমার প্রেরণাও যুগিয়েছে অর্থাৎ তোমরা এর ফলে পুরস্কৃত হবে, শর্ত হলো সংশোধন। এটি একটি তৃতীয় রাস্তা বা পথ যা কুরআন পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছে। এখন একজন সুস্থ প্রকৃতির মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, এগুলোর মাঝে তুলনা করে দেখা যে, কোন শিক্ষা মানব-প্রকৃতি-সম্মত আর কোন শিক্ষা এমন যাকে কোন সুস্থ প্রকৃতি এবং মানুষের বিবেক ঘৃণা করে।

অতএব ইসলামী শিক্ষাই এমন শিক্ষা যা সকল যুগে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান দেয় তা শাস্তি সংক্রান্ত হোক বা অন্যান্য বিষয় সংক্রান্তই হোক না কেন। ইসলাম বলে, একবার ক্ষমা করলে হিংসা, বিদ্বেষ আর প্রতিশোধ-প্রবণতা মন থেকে বের করে দাও। তিনি বলেন, অনেকের হৃদয়ে এত বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধ-প্রবণতা থাকে যে, পিতা-পিতামহের যুগের কথাও তারা স্মরণ রাখে- ক্ষমা করে না। তিনি বলেন, হৃদয়ে বিদ্বেষ বা প্রতিশোধ লালন করা মু'মিনের সাজে না। মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ দেখুন, উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর লাশের অঙ্গচ্ছেদ করে, নাক, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে সেই লাশ বা মরদেহ বিকৃত করেছে, তার কলিজা বের করে তা চিবিয়েছে। এক কথায় সে

অত্যাচার ও বর্বরতায় সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পক্ষান্তরে এতসব কিছু সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আদর্শ দেখুন! মক্কা বিজয়ের সময় হিন্দা মুখ ঢেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈঠকে এসে উপস্থিত হয়, প্রকাশ্যে আসা সম্ভব ছিল না কেননা; তার এই অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধেও মৃত্যু দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁর (সা.) বৈঠকে এসে সে বয়আত করে, ইসলাম গ্রহণ করে এবং মহানবী (সা.)-কে কিছু প্রশ্ন করে। মহানবী (সা.) তার কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা? সে বলে, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রসূল এখন আমি আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়ে গেছি, পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে তার জন্য মার্জনা করুন। তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করেন আর এই ক্ষমার তার ওপর এমন সুগভীর প্রভাব পড়ে যে, তার অবস্থাই পাল্টে যায়। সে ঘরে গিয়ে মহানবী (সা.)-কে নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খাবার প্রস্তুত করে এবং দু'টো ভুনা করা বকরা বা খাসি পাঠিয়ে দেয় এবং বলে, আজকাল বকরা বা খাসির স্বল্পতা রয়েছে তাই এই সামান্য উপহার গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! হিন্দার মেষপালে বরকত দাও। এর ফলশ্রুতিতে তার মেষ বা ছাগপাল এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তার জন্য তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একটি শ্রেণী এমন যারা ক্ষমা করতে জানেই না, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পিতা-পিতামহের যুগের মনোমালিন্যকেও তারা হৃদয়ে পুষে রাখে। অপর দিকে এমন আত্মাভিমানহীন ও নির্লজ্জ মানুষও রয়েছে, নেক জীবনের জন্য তারা এক প্রকার কলঙ্ক আর ক্ষমার নামে তারা লজ্জাবোধ বিবর্জিত আচরণ করে। অতএব আত্মাভিমানহীন হওয়াও উচিত নয় আর অন্যায়ও করা উচিত নয়। কেউ যদি কারো কন্যা বা বোনের সম্মানের ওপর আঘাতহানে বা সম্ভ্রমের ওপর হামলা করে তাহলে আইনের গন্ডিতে থেকে অবশ্যই তার ব্যবস্থা নেয়া উচিত, ক্ষমার প্রশ্নই উঠে না। তাই ক্ষমা এবং আত্মমর্যাদাহীনতার মাঝে পার্থক্য জানার চেষ্টা থাকা চাই, কিন্তু কোনভাবেই আইন হাতে তুলে নিবেন না, এটি আবশ্যকীয় শর্ত।

আমি যেমনটি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক জায়গায় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করেছেন। আমি আরো কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। বাহ্যতঃ উদ্ধৃতি দেখে মনে হয়, একই বিষয় বার বার চোখের সামনে আসছে, কিন্তু তিনি সর্বত্র এই প্রেক্ষাপটে যা বলেছেন তাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সদুপদেশ রয়েছে।

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, অন্যায়ের শাস্তি অন্যায় অনুপাতেই হওয়া উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে আর সেই মার্জনার ফলে যদি সংশোধন হয়, ক্ষমা পাপে পর্যবসিত না হয়; তাহলে খোদা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন আর তাকে তিনি এর প্রতিদান দিবেন। অতএব কুরআন অনুসারে সব স্থানে প্রতিশোধ নেয়াও প্রশংসনীয় নয় আর সব জায়গায় মার্জনাও

প্রশংসনীয় নয় বরং স্থান-কাল ভেদে তা হওয়া উচিত। প্রতিশোধ এবং মার্জনার আচরণ স্থান-কাল ভেদে হওয়া উচিত, লাগামহীন ভাবে নয়; আর এটিই কুরআনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হন যার উদ্দেশ্য পুত-পবিত্র এবং যার উদ্দেশ্য হলো সংশোধন। নির্লজ্জ বা আত্মাভিমানহীন ব্যক্তির ক্ষমাতে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হবেন না। আর তিনি তার প্রতিও সন্তুষ্ট নন যার উদ্দেশ্য কেবল শুধু প্রতিশোধ নেয়া। এই উভয় বিষয়কে দৃষ্টিতে রাখা চাই, এতটা নির্লজ্জ হওয়া উচিত নয় যা আত্মাভিমানহীনতায় পর্যবসিত হতে পারে। এমনটি করলেও আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না আর কেবল প্রতিশোধের মন-মানসিকতাও থাকা উচিত নয় কেননা; তা খোদাকে অসন্তুষ্ট করে। তাই এই উভয় সীমা সামনে রেখে ক্ষমা এবং শাস্তির সিদ্ধান্ত করা উচিত। এ সম্পর্কে জামাতের ওহদাদার (পদাধিকারী) ও ব্যবস্থাপনাকে দৃষ্টি রাখা চাই; সচরাচর খেয়াল রাখা হয়। কতিপয় লোকের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত হয় বা আমার কাছে যে সুপারিশ আসে আমি এটি বলবো না যে, প্রতিশোধ-প্রবণতার কারণে এমনটি হয়ে থাকে, কিন্তু অনেক সময় অবশ্যই যা ঘটে তাহলো সুপারিশকারীর সহজাত প্রবণতা থেকে থাকে কঠোরতার দিকে আর অনেকেই অপ্রয়োজনীয় নমনীয়তা এবং মার্জনার প্রবণতা রাখে, যার ফলে অনেক অপছন্দনীয় বিষয় সামনে আসে, তাই (সর্বত্র) শাস্তি দেয়াও পছন্দনীয় নয় আর ক্ষমা করাও প্রশংসনীয় বিষয় নয়। আসল বিষয় হলো খোদার সন্তুষ্টি অর্জন। এটি তখন লাভ হয় যখন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সংশোধন আর এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর, তা উমুরে আমা হোক বা কাযা বা বিচার বিভাগই হোক না কেন তাদের উচিত বিষয়ের গভীরে অবগাহন করে সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত করা যেন সেই সঠিক ব্যবস্থা এবং সেই প্রকৃত পরিস্থিতি পরিবেশ আমরা জামাতের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি যা খোদার সন্তুষ্টিতে পর্যবসিত হবে আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়াও করা উচিত এবং সাহায্যও চাওয়া উচিত। যখনই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা দোয়ার ভিত্তিতে হওয়া উচিত, এরপর খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে সুপারিশ করা উচিত যেন সকল ক্ষতিকর দিক থেকে সেই ব্যক্তিও নিরাপদ থাকে যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বা অভিযোগ করা হচ্ছে। অপরদিকে জামাতের ব্যবস্থাপনাও যেন সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকে অধিকন্তু জামাতের কোন সিদ্ধান্ত যেন অশান্তির কারণ না হয়।

অনুরূপভাবে আরেক জায়গায় স্বীয় গ্রন্থ 'নাসীমে দাওয়াত'-এ এই বিষয়ের প্রেক্ষাপটে তিনি (আ.) বলেন, ইসলামের ওপর আপত্তিকারীদের এবং অমুসলমানদের ইসলামের এই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার জ্ঞান থাকা উচিত। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন, এটি একটি এমন সুন্দর শিক্ষা যা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না।

তিনি (আ.) বলেন, কেউ যদি তোমাকে কষ্ট দেয়, যেমন দাঁত ফেলে দেয় বা চোখ নষ্ট করে তাহলে তার শাস্তি ততটুকুই যতটা সে অপরাধ করেছে, কিন্তু এমন ক্ষেত্রে যদি পাপ ক্ষমা কর আর এর ফলে কোন ভালো ফলাফল প্রকাশ পায় এবং তার সংশোধন হয়ে যায় অর্থাৎ অপরাধী যদি

ভবিষ্যতে এই অভ্যাস থেকে বিরত থাকে এবং অপরাধীর সংশোধন হয়ে যায় তাহলে এমন ক্ষেত্রে ক্ষমা করাই শ্রেয় আর এই ক্ষমার ফলে ক্ষমাকারী আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রতিদান পাবে।

দেখ! এই আয়াতে উভয় দিক দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে আর মার্জনা ও প্রতিশোধ উভয়টিকে সময়ের দাবির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সময়ের দাবি হলো, স্থান-কাল ভেদে কাজ হওয়া উচিত আর এটিই প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা যার ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যবস্থা কাজ করছে। স্থান-কাল ভেদে কঠোর ও কোমল উভয় ব্যবহার করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তোমরা দেখ, আমরা একই প্রকার খাবারের ওপর সব সময় জোর দিতে পারি না বরং সময়ের দাবি অনুসারে খাবারে পরিবর্তন আসতে থাকে। গরমকালে আমরা ভিন্ন জিনিস পছন্দ করি আর শীতকালে অন্য রকম সুষম খাবারের কথা বলা হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃতির যে নীতি আছে তা এ ক্ষেত্রেও কাজে আসা উচিত। শীত এবং গরমে কাপড়ও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন হতে থাকে। একইভাবে আমাদের নৈতিক অবস্থাও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনের দাবি রাখে। যেভাবে আমাদের খোরাক পরিবর্তিত হয়, আর খোরাকও আবহাওয়া অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে গ্রীষ্মে এবং শীতের ঋতুতে কাপড়ও পরিবর্তিত হয়। এসব কিছু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আমাদের নৈতিক অবস্থাও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন চায়।

পোশাক সম্পর্কে আমি কথা প্রসঙ্গে এটিও বলতে চাই, এখানে মানুষ গ্রীষ্মে পোশাকের দিক থেকে উলঙ্গ হয়ে যায়, বিশেষ করে মহিলারা। শীতকালে স্কার্ফ বা মাফলার আর কোর্ট দিয়ে(নিজেদের) আবৃত করে রাখে আর এটি যথাযথ পোশাক হয়ে থাকে। একই পোশাক অর্থাৎ শীতকালে এরা যেমন পোশাক পরে তা যদি মুসলমান মহিলারা, হিজাব পরিধানকারিনী মহিলারা পরিধান করে আর তারা গ্রীষ্মকালে মাথা ঢাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। বলা হয়, এভাবে নারীর অধিকার খর্ব হচ্ছে। সরকার এতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নাক গলানো আরম্ভ করে। এটি এক প্রকার হস্তক্ষেপ বা নাক গলানোই যার উদ্দেশ্য, সংশোধন নয় বরং এটি অন্যায়। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী সাহেবের বিবৃতি এসেছে, **"আমরা ভাবছি, যেসব মহিলা পাবলিক স্থানে পর্দা করে বা চাকুরীজীবি মহিলারা যদি পর্দা করে আসে তাহলে তাদেরকে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করা হবে।"** এই জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে তারা আরেকটি কঠোর পন্থা অনুসরণ করছে যার ফলাফল হয়ে থাকে নৈরাজ্য ও অসন্তোষ । ইসলাম বলে, এমন আইন প্রনয়ন করো না বা এমন সিদ্ধান্ত করো না যার ফলে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে বরং সেই সিদ্ধান্ত কর যা সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং সেই ব্যক্তির জন্যও কল্যাণকর। এমন সিদ্ধান্ত যদি হয় তাহলে এর ফলে আল্লাহ্ তা'লাও সন্তুষ্ট হবেন। যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

একইভাবে আমাদের নৈতিক অবস্থাও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন চায়। একটি সময় হয়ে থাকে প্রতাপ দেখানোর বা কঠোরতার, সেখানে নমনীয়তা ও মার্জনার ফলে অশান্তি দেখা দেয় দ্বিতীয় স্থানটি হয়ে থাকে নমনীয়তা এবং বিনয়ের, সেখানে ক্রোধ ও প্রতাপ প্রদর্শন ইতরতা গণ্য

হয়। এক কথায় স্থান ও কাল একটি বিশেষ বিষয়ের দাবি রাখে, যে ব্যক্তি সময়ের দাবিকে উপক্ষো করে সে মানুষ নয় বরং পশু, সভ্য নয় বরং বন্য।

স্থান-কাল ভেদে আর সময়ের দাবি অনুসারে কাজ করার জন্য প্রকৃতির নিময় থেকে তিনি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যেমনটি আমি বর্ণনা করলাম। খাবার সুষম হওয়া প্রয়োজন, মানুষ এক প্রকার খাবার সর্বদা খায় না। আজকালও যেসব পুষ্টি বিষারদ রয়েছে তারা তাদের রোগীদেরকে বড় বড় তালিকা বানিয়ে দেয় যে, এই অনুসারে খাবার খাও আর খাবারের মাধ্যমেই চিকিৎসা হয়। অনুরূপভাবে আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হয়ে থাকে আবহাওয়ার দাবী অনুসারে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন নৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি (আ.) বলেন, কোন স্থানে নমনীয়তা ও মার্জনার ফলে বিষয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর কোন ক্ষেত্রে কঠোরতা ও দাপট দেখালে বিষয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। অতএব মানব প্রকৃতির এই দিকটিকে সর্বত্র বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে, অর্থাৎ পরিবর্তন যেন তার প্রকৃতি সম্মত হয়। সংশোধনের জন্য যা কিছু প্রস্তাব করা হয়েছে, তা যেন মানুষের প্রকৃতিসম্মত হয়ে থাকে আর এটিই মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন অযথা মার্জনা ও ক্ষমাকে বৈধ আখ্যায়ীত করেনি । এর ফলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয় আর ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, বরং সেই মার্জনার অনুমতি দিয়েছেন যার ফলে বা যার মাধ্যমে কোন প্রকার সংশোধন সম্ভব।

অতএব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, মার্জনা এবং ক্ষমা যদি বিনা কারণে এবং অযথা হয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ে আর মানুষের মাঝে লাগামহীনতা দেখা দেয়, মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, সিষ্টেম আর বাকী থাকে না। অতএব যারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি পায়, তাদের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এই কথার প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, আমরা কীভাবে আত্মসংশোধন করতে পারি, এর জন্য ইস্তেগফার করা উচিত, আত্মসংশোধন করা উচিত। প্রতিশোধের মন মানসিকতা নিয়ে জামাত কাউকে শাস্তি দেয় না, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, সংশোধনের উদ্দেশ্যেই শাস্তি দেয়া হয়। আর এই চেষ্টাই হওয়া উচিত আর এমনই হয়ে থাকে। কেবল পদাধিকারীদেরই দোষ নয় বা কেবল তারাই দায়ী নয় বরং সাধারণ সদস্যদেরও অপরাধ বা দোষ থেকে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি দৈনন্দিন জীবনে বা পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডিতে আত্মজিজ্ঞাসা করে যে, অন্যদের সম্পর্কে তার চিন্তাধারা কেমন, আর নিজেকে সে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাহলে এর ফলে সমাজে এক প্রকার সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

তাই আসল বিষয় হলো, প্রতিটি কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত, এদিকে সদা দৃষ্টি থাকা চাই । এটি যদি হয়, কেবল তবেই সংশোধন হবে। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

পাপের শাস্তি পাপ অনুসারে বা পাপ অনুপাতে দেওয়া উচিত কিন্তু কেউ যদি মার্জনা করে সেই মার্জনা যেন অযথা না হয়; বরং এর উদ্দেশ্য সংশোধন হওয়া উচিত। এমন ব্যক্তির প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার হাতে। যেমন চোরকে যদি ছেড়ে দেয়া হয় সে ধৃষ্টতার সাথে ডাকাতি করবে, কাজেই তাকে শাস্তিই দেয়া উচিত। কিন্তু যদি দু'জন চাকরের একজন এমন হয় যে একটু চোখ রাঙ্গানিতেই লজ্জিত হয়, তার অন্যায় কাজকে রক্তিম চোখে দেখলে এতে সে লজ্জিত হয় এবং তা তার সংশোধনের কারণ হয়, এমন ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। অনেকে ইঙ্গিতেই বিষয় বুঝে যায়, তাদের কিছু বলতেই হয় না, তাদের দিকে তাকালেই তাদের সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় জন যে কিনা জেনেশুনেই দুষ্কৃতির আশ্রয় নেয় তাকে মার্জনা করলে সে নষ্ট হয়, তাকে শাস্তি দেয়াই যুক্তিযুক্ত। এখন বল! যুক্তিযুক্ত নির্দেশ কি সেটি যা কুরআন দিয়েছে, নাকি সেটি যা ইঞ্জিল উপস্থাপন করে? প্রকৃতির নিয়ম কি চায়? তা স্থান-কালের নিরিখে সিদ্ধান্ত করার শিক্ষা দেয়। সংশোধনের মাধ্যমে মার্জনার শিক্ষা এমন উন্নত শিক্ষা যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। শুসভ্য মানুষকে এটিই অনুসরণ করতে হয় আর এই শিক্ষা অনুসরণ করলে মানুষের মাঝে উদ্ভাবনী শক্তি এবং অন্তদৃষ্টি প্রখর হয়। এক কথায় যেন এটি বলা হয়েছে, সকল স্বাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে দেখ আর অন্তঃদৃষ্টির ভিত্তিতে চিন্তা কর। বলা হয়, ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং মানুষকে বাধাগ্রস্ত করে। তিনি (আ.) বলেন, এই একটি নির্দেশকেই দেখ এবং ভাব, এর ফলে কীভাবে অন্তঃদৃষ্টি এবং উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি (আ.) বলেন, মার্জনার ফলে যদি উপকার হয় তাহলে মার্জনা কর কিন্তু যদি কেউ নোংরা আর দুষ্কৃতকারী হয়ে থাকে তাহলে 'جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا' অনুশাসন মেনে চল, ইসলামের অন্যান্য পবিত্র শিক্ষাও এমনই যা সকল যুগে দিবালোকের মত স্পষ্ট।

অতএব এ দু'টো কথা আমাদের সব সময় দৃষ্টিতে রাখা উচিত কননা আমাদের সংশোধন করতে হবে, পাপ দূরীভূত করতে হবে, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে হবে। কেননা তিনি যালেম বা অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কুরআনী শিক্ষা অনুধাবন করা এবং সেই অনুসারে জীবন যাপনের তৌফিক দিন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা রাবওয়ার জনাব বেলাল মাহমুদ সাহেবের, পিতার নাম হলো মমতাজ মাহমুদ সিন্ধী। মরহুম রাবওয়ার দারুল ইয়ামান গারবির অধিবাসী। বেলাল মাহমুদ সাহেবকে ২০১৬ সনের ১১ই জানুয়ারী রাতের বেলা রাবওয়াতে শহীদ করা হয়েছে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি রাতের বেলা ঘরে ফিরছিলেন। অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহী গুলী করে তাকে হত্যা করে। ঘটনার বিবরণ হলো, রাবওয়ার রেল ফটকস্থ বেলাল মার্কেটের দোকান থেকে তিনি ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। রাবোয়ার গিরির নিকটবর্তী স্থানে অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহীরা গুলী করে পালিয়ে যায়। তার গায়ে ৫টি বুলেট বিদ্ধ

হয় এরমধ্যে, দু'টো মাথায় আঘাত করে। এরপর তাকে ফযলে ওমর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর ফয়সালাবাদের এলাইড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে অপারেশনের উদ্দেশ্য ডাক্তাররা তার স্বাস্থ্য কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার অপেক্ষায় থাকে কিন্তু বুলেট বের করার জন্য অস্ত্রোপচারের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

১৯৮৯ সনে মিরপুর খাস জেলার নওকোর্টের গোঠ বেলাল নগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ওয়াক্‌ফে নও-এর বরকতময় তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। ২০০৩ সনে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। এরপর তিনি এবং তার পরিবার রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি ২০০৮ সনে ওয়াক্‌ফ নবায়ন করে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ওসীয়্যত দপ্তরে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত জামাতের কাজ করেছেন। তার ছোট্ট একটি দোকান ছিল, সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণের জন্য সেই দোকানে যেতেন। নিজ হালকায় বিভিন্ন পদে থেকে তিনি জামাতের কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আজকাল তিনি পাড়ার সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে কাজ করছিলেন। ২০১৫ সনের এপ্রিল মাসে মরহুম বিয়ে করেন। তার স্ত্রী বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। আল্লাহ্ তা'লা তাকে কৃপাবারিতে সিক্ত করুন এবং অনাগত সন্তানের ওপরও করুণাবারি বর্ষণ করুন। খুবই ভদ্র, সহানুভূতিশীল, মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কাজের প্রতি আন্তরিক, পরিশ্রমী এবং আনুগত্যশীল ছিলেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভদ্রতা ও ভালোবাসার সাথে আচরণ করতেন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, মা এবং বোনদের সাথে গভীর স্নেহের সম্পর্ক রাখতেন।

তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী মুবাশ্বেরা বেলাল সাহেবা, মা মুবারেকা মমতাজ সাহেবা, এছাড়া এক ভাই এবং দু'বোন রেখে গেছেন। পূর্বের এবং বর্তমান সেক্রেটারী মজলিসে কারপরদায উভয়ই এই কথা লিখেছেন, মরহুম খুবই কুশলী এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। কখনও কোন সময় আলস্য প্রদর্শন করেছেন এমনটি হয়নি, সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকতো। যথা সময় অফিসে আসতেন, যে কাজের জন্যই বলা হতো ছুটে গিয়ে করতেন। এমন কর্মী কমই পাওয়া যায় যারা সব সময় হাসি মুখে কাজ করে। সব সময় নিজের কাজের ধ্যানে থাকতেন, আনুগত্যের ক্ষেত্রে বড় উন্নত পর্যায়ের ছিলেন। জামাতী কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। বর্তমান সেক্রেটারী কারপরদায নাসীর সাহেব লিখেন, খিলাফতের সাথে শহীদের এমন সম্পর্ক ছিল যা দেখে ঈর্ষা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং মনোবোল দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।